Vol. 59 | No. 3 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মাহমুদুল হকের উপন্যাস: মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ

Volume	59
Issue	3
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Kamrun Nahar
Published online	April 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v59i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i3.7
Pages	133-149
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩১॥ জুন ২০২৪
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i3

DOI: 10.62328/sp.v59i3.7
প্রবন্ধ জমাদান: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১৩৩-১৪৯

মাহমুদুল হকের উপন্যাস: মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ

কামরুন নাহার
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: shilabrishty18@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বিভাগোত্তর বাংলা সাহিত্যে মাহমুদুল হক (১৯৪০-২০০৮) একজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। মাত্র আটটি উপন্যাস রচনা করেই তিনি তাঁর স্বতন্ত্র স্বরের জানান দিয়েছেন। মাহমুদুল হক তাঁর উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, জীবনবাস্তবতা, দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ—এসব বিষয়কে বহুমাত্রিকতা দান করেছেন। ব্যক্তির মনের গভীরে প্রবেশ করে তাদের চেতনার বহুস্তরের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন শৈল্পিক কুশলতায়। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর *অনুর পাঠশালা* ও *কালো বরফ* উপন্যাসে প্রকাশিত ব্যক্তির চেতনালোকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি দেশ-কাল-রাজনীতি ও পরিবার কী করে ব্যক্তিমানসকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে তার সূত্রসন্ধানও বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

মূলশব্দ

মাহমুদুল হক, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, জীবনবিমুখতা, *অনুর পাঠশালা*, *কালো বরফ*।

উপন্যাস মনোবিজ্ঞান বা মনস্তাত্ত্বিক অভিসন্দর্ভ না হলেও উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের বিষয়কে মূর্ত ও বিন্যস্ত করার জন্য যেসব চরিত্রের আশ্রয় নেন, সেসব চরিত্রের থাকে নির্দিষ্ট সামাজিক ভিত্তি। ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাদের চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই চরিত্রের মানসিক অবস্থাকেও সমাজের বাস্তবানুগ করে রূপ দিতে হয়। তাই ঔপন্যাসিককে তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের সামগ্রিক চেতনা নিয়েই সক্রিয় থাকতে হয়। *স্ট্রিম অব কনশাসনেস ইন মডার্ন নভেল* (১৯৬৮) গ্রন্থে রবার্ট হাম্ফ্রে লিখেছেন যে, ব্যক্তির চেতনা হচ্ছে তার মানসিক মনোযোগের সমগ্র অবস্থা (হাম্ফ্রে, ১৯৬৮)। ঔপন্যাসিক যখন ব্যক্তির চেতনা নিয়ে কাজ করেন তখন প্রকারান্তরে তাঁকে ব্যক্তির এই সামগ্রিকতা নিয়েই কাজ করতে হয়। উপন্যাস-শিল্প ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিকতা-নির্ভর সৃষ্টি। সমাজ-সংস্থানের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তির মানসিক প্রতিফলন তার চিন্তা ও কর্ম। সেই চিন্তা ও কর্মের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তার বিবিধ দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্কসূত্রের মধ্যেও থাকে ব্যক্তিগত অনুভব ও সামাজিকতার অবভাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) উপন্যাসে ব্যক্তির মনের গহিন কোণের চিন্তার প্রকাশে ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক সত্তার মধ্যে যোগসূত্র রচিত হয়। তাঁর *লালসালু* (১৯৪৮) উপন্যাসের মজিদের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলে সেই কালের ও সেই সমাজের অবস্থাও বুঝতে পারা যায়। *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) উপন্যাসে একই সঙ্গে ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকট ও সত্য প্রকাশের তাড়নায় বিদীর্ণ ব্যক্তির মনোজগতের সঙ্গে সংযোগ ঘটে পাঠকের।

১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের সামাজিক বিকাশে নগরচেতনার প্রাধান্য গুরুত্ব পেতে থাকে। বিশেষত, পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকা হওয়ার ফলে পুঁজির একটা স্থানান্তর ঘটে কলকাতা থেকে ঢাকায়, তৈরি হয় নতুন পুঁজির সম্ভাবনা। এই পুঁজিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রেণির আগমন ঘটতে থাকে ঢাকায়। উচ্চবিত্তের প্রসার, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যকার প্রতিযোগিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে নতুন এক সামাজিক বিন্যাস ও তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, নগরায়ন এবং উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় নতুন-নতুন মানুষের ঢাকায় আগমন ইত্যাদি কারণে একটি নতুন প্রত্যাশার কেন্দ্র হয়ে ওঠে নির্মীয়মাণ ঢাকা। ক্রমান্বয়ে এই প্রত্যাশার সঙ্গে শ্রেণিবৈষম্য, স্বার্থ, মানুষের মধ্যকার নানা সম্পর্ক ইত্যাদি জড়িয়ে যেতে থাকে। এই অবস্থা ঢাকার মানুষের জন্য নতুন হওয়ার কারণে এই তরঙ্গের ধাক্কা অনেকেই সহজভাবে নিতে পারেনি। নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে সমস্যা হতে থাকে কারো-কারো, কেউ-কেউ বেশামাল হয়ে পড়ে। নবনির্মিত ঢাকা মানুষকে নতুনভাবে তৈরি করতে শুরু করে। মানুষ পুরানো মূল্যবোধ ফেলে দিয়ে নতুন চিন্তাচেতনায় বিকশিত হতে থাকে। তাদের মনোজগতে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলতে থাকে এই ঢাকা। শিল্পায়ন, মধ্যবিত্তের বিকাশ, পুঁজির প্রসার প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনকেই শুধু পাল্টে দেয় না, তাদের চিন্তাভাবনা ও প্রত্যাশাকেও বদলে দেয়। মাহমুদুল হকের উপন্যাস বাংলাদেশের ইতিহাস, সামাজিক বাস্তবতা ও বিবর্তনের সমান্তরালে বিচার্য।

মাহমুদুল হকের আগে বাংলাদেশের প্রচলিত উপন্যাস যে ধরনের কাহিনির রেখা অনুসরণ করে গেছে সেখানে ঠিক এ রকম কাহিনিবৃত্তের দেখা পাওয়া যায়নি। গ্রামীণ বিষয়ের

উপন্যাসে ভূমিকেন্দ্রিক ক্ষমতা-কাঠামোর সূত্রে জমিদার-জোতদার-মহাজন কিংবা ধর্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার সূত্রে পির-ফকির-দরবেশ—এসব চরিত্রনির্ভর কাহিনি উপন্যাসে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। সেই সঙ্গে গ্রামীণ নারী চরিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি বাংলাদেশের উপন্যাসকে জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পান্বেষার অভিযাত্রীরূপে পরিচিতি এনে দেয়। একইভাবে শহরকেন্দ্রিক উপন্যাসে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যকার সম্পর্কসূত্র গুরুত্ব লাভ করে। পূর্ববাংলার সমাজজীবন তখনও শিল্পাগ্রসরতার পরিণতিতে পৌঁছে না বলে পুরোপুরি শিল্পোন্নত শহুরে জীবনের ছবিও উপন্যাসে আসে না। শহর ও গ্রামের যৌথ জীবনের ছবি কোনো-কোনো উপন্যাসের আখ্যানে স্থান পায়। এসবের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোককাহিনি প্রভৃতি বিষয়েও রচিত হয় নানা উপন্যাস। কিন্তু শহরজীবনের সচ্ছল সীমানায় বিচ্ছিন্নতার শিকার একটি কিশোর-মনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস মাহমুদুল হকের সূত্রেই লাভ করে বাংলাদেশের কথাসাহিত্য। নারী-পুরুষের তথাকথিত ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনিও এটি হয়ে ওঠে না, যদিও উপন্যাসটির মধ্যে সেই সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত ছিল। কাহিনির সংবদ্ধতার চাইতেও অনুভূতির সূক্ষ্মতায় জীবনের গতি-পরিণতি ও জটিলতাকে স্পর্শ করতে চান এ কালের কথাশিল্পী মাহমুদুল হক। বর্তমান প্রবন্ধে মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের নিরিখে মাহমুদুল হকের *অনুর পাঠশালা* (১৯৭৩) ও *কালো বরফ* (১৯৯২) উপন্যাসদুটিতে প্রকাশিত চরিত্রের শূন্যতাবোধ, নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিরাসক্ততার স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

অনুর পাঠশালা লেখকের প্রথম উপন্যাস এবং এর রচনাকাল ১৯৬৭। *কালো বরফ* উপন্যাসটি রচিত হয় প্রথম উপন্যাসের এক দশক পরে, ১৯৭৭ সালে। এই দুইয়ের মাঝখানে মাহমুদুল হক রচনা করেন আরো দুটি উপন্যাস: *নিরাপদ তন্দ্রা* (১৯৬৮) ও *জীবন আমার বোন* (১৯৭২)। প্রথম উপন্যাসে জীবনের গভীর সমস্যা বা সংকটের আপাতনিশানা দেখা না গেলেও মাহমুদুল হক ব্যক্তির অন্তর্জগতের মৌন মুখরতা দিয়ে এমন একটি জীবনের কথা বলতে চেয়েছেন যে জীবনের সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু সে জীবন একই সঙ্গে দুঃখ ও অপচয়ে ক্লিন্ন। মাহমুদুল হকের প্রথম উপন্যাস স্বপ্নময়তার পরিবর্তে জানায় এক স্বপ্নহীনতার বার্তা। এ থেকে তাঁর ঔপন্যাসিক চেতনার ঝোঁক চিনে নেওয়া যায়। এ কথাও স্মরণযোগ্য, ১৯৬৭ সালে প্রথম উপন্যাস *অনুর পাঠশালা* যখন রচিত হচ্ছে তখন নয়া ঔপনিবেশিকতার শিকার পূর্ববাংলাসহ সমগ্র দেশে সামরিক শাসন বিরাজমান। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের জের তখনও কেটে যায়নি, বরং এই সময় থেকে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া হয়ে ওঠে প্রবলভাবে দ্বন্দ্বময়। দেশ জুড়ে চলতে থাকে ভিন্ন দিকে মোড় নেওয়ার প্রস্তুতি। ফলে জনজীবনে আসে প্রভূত পরিবর্তন। এই অশান্ত পরিবেশে সামাজিক নানা পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষ শিকার হতে থাকে ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতার। তাদের মনস্তত্ত্ব ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলে ব্যক্তিমানুষ নিজ-নিজ বলয়ে প্রবিষ্ট হয়ে নিজস্ব পৃথিবী রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। মাহমুদুল হক এমন মানুষদের নিয়েই রচনা করেছেন তাঁর *অনুর পাঠশালা* ও *কালোবরফ*, 'মানব ভাবনার জটিল জগতে ডুব দিয়ে তিনি জীবনের অতল পর্যন্ত দেখে নিয়েছেন' (মাহবুব ২০১০: ১২৮)। দুটি উপন্যাসই সামাজিক ও পারিবারিক নানা জটিলতায় আকীর্ণ চরিত্রের মনোজাগতিকে টানাপড়েনের মানবিক কাহিনি হয়ে উঠেছে।

প্রথম উপন্যাসেই মাহমুদুল হক তাঁর সীমানার সংকীর্ণ চৌহদ্দি ছেড়ে যোগ দেন ভুবনের উদার, খোলামেলা প্রাঙ্গণে। এক দিকে একা একটি কিশোরের নিভৃতি, আরেক দিকে তার খেলার সঙ্গীরা—তাদের নামগুলো থেকেই তাদের সঙ্গে অনুর পার্থক্য বোঝা যায়, যেমন: ফালানি, ফকিরা, গেনদু ইত্যাদি। নিজে অনু সমাজের উপরতলার বাসিন্দা, কিন্তু তার মনের মধ্যে মুক্তির স্বপ্ন। ফালানি-ফকিরারা সেই মুক্ত পৃথিবীর বাসিন্দা। অনুর নিঃসঙ্গতা অস্বস্তি হয়ে তাকে সারাক্ষণ কষ্ট দেয়। ক্রমে অনুর পৃথিবীর নিঃসঙ্গতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলে পাঠক অনুভব করে যে তা কেবল অনুর নিঃসঙ্গতাই নয়—সেখানে জড়িয়ে রয়েছে আরো মানুষ এবং অন্য এক জটিল মনোজাগতিক ও পারিবারিক জীবনের বৃত্তান্ত। আবার, তা পরিবার ছাড়িয়ে চলে যায় সমাজের দিকে। অনুর ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতার উৎস তার নিজের অন্তর, কিন্তু এর দায় বইতে হয় অনুর পিতামাতাকেও। এভাবেই সম্পর্কসূত্রগুলো উন্মোচিত হতে থাকে মাহমুদুল হকের নিপুণ শব্দবয়নে। অনুর নিরানন্দ দিনযাপন ও নিঃসঙ্গতা তার বেড়ে ওঠার পথে প্রবল বাধা, কিন্তু তার চারদিককার নির্বিকার পরিস্থিতি তাকে ঠেলে দেয় এক অবলম্বনহীন গন্তব্যের দিকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) উপন্যাসে ছিল অনেক মানুষের ভিড়, দারিদ্র্যে জর্জরিত হলেও মানুষ ভোগেনি একাকিত্ব কিংবা বিষণ্নতায়। মাহমুদুল হকের *অনুর পাঠশালা*ও আধুনিক এক পথের কাহিনিই শোনায় এবং দেখায় অন্য রকম সংসারচিত্র, যেখানে গৃহ শান্তির নয়—বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। পাশাপাশি বাস করেও মানুষগুলো পরস্পর থেকে দূরবর্তী। এমনই সে গৃহ যেখান থেকে পালিয়ে একেবারে দৃষ্টির আড়াল হয়ে যেতে চায় সেখানকার বাসিন্দা—পালাতে সে চায় নিঃসঙ্গতা থেকে। *অনুর পাঠশালা* তাই মাহমুদুল হকের গড়া এক বিচ্ছিন্নতাবোধের শৈল্পিক চিত্র।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র অনু, তার চোখ দিয়ে দেখা হয়েছে সমস্ত কিছু এবং তার অনুভূতির জগৎটাই গোটা উপন্যাসের পটভূমি তৈরি করে। অনু একটি কিশোর চরিত্র, কিন্তু *অনুর পাঠশালা* কিশোর উপন্যাস নয়। অনুকে ঘিরে নির্মিত পরিবার-সমাজের পরিবেষ্টনী বৃহদর্থে অনুকে ছাড়িয়ে অনেকের কাহিনি হয়ে দাঁড়ায়। অনু-চরিত্রটির আবেগ-অনুভূতি ও পরিণতি উপন্যাসটির মূল কেন্দ্রবিন্দু। এক সচ্ছল-উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান অনুর বাবা উচ্চ আদালতের আইনজীবী এবং মা গৃহিণী। ছোট এই সংসারে আগমন ঘটে অনুর মায়ের ইংরেজি শিক্ষকের। এই চরিত্র সাধারণ কোনো চরিত্র নয়, এর থাকে দূরপ্রসারী বিস্তৃতি। অনু তার মায়ের কাছ থেকে জানতে পারে, লোকটি খুব ভালো, তিনি অনুকেও ভালোবাসেন। যেহেতু লোকটিকে অনুর মা ভালো বলেন এবং অনু তার মাকে ভালোবাসে, তাই চরিত্রটি অনুর সত্তায় একটি ইতিবাচক স্থান দখল করে। এই শিক্ষকের সূত্রে পরবর্তীকালে অনুর মা সম্পর্কে আরো সবিস্তার জানা হলে তা উপন্যাসে নতুন এক মোড় রচনা করে। ইংরেজি শেখা শেষ হলে অনুর মা পালিয়ে যাবেন অনুর বাবার কাছ থেকে, পালিয়ে গিয়ে নিজে একটা চাকরি নেবেন। এখানেই অনু, অনুর বাবা, অনুর মা এবং তাঁর ইংরেজি শিক্ষক উপন্যাসের ত্রিমুখী অবস্থানকে বদলে দেয়। ইংরেজি শিক্ষক উপন্যাসটির মুখ ঘুরিয়ে দেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে।

অনুর পাঠশালা উপন্যাসে চরিত্রসংখ্যা কম; চরিত্রের চিন্তনক্রিয়া উপন্যাসের ঘটনার গতিপ্রকৃতিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি অনুর মনোজগতেও প্রভূত পরিবর্তন ঘটায়। তার

ঘরের জীবন ও ঘরের বাইরের অবারিত জীবন—এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র যেমন থাকে, তেমনি থাকে দ্বান্দ্বিকতাও, কেননা গৃহ-অভ্যন্তরে-থাকা অনু ঘর থেকে পালিয়ে যেতে চায় নিরুদ্দেশে; আবার, বাইরের জীবনে খেলার সঙ্গীদের মধ্যে নিজেকে হারালে সে ভুলে যায় ঘরে ফেরার কথা। অনুর মানসিক অবস্থাটাই উপন্যাসের মূল জায়গা। উপন্যাসে এক দিকে থাকে অনুর কিশোর মনের দূরকল্পনার বিস্তার এবং অন্য দিকে তার ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা। উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতে বর্ণিত অনুর মানসিক অবস্থা দেখা যাক:

> দুপুরে অনু একা থাকতে পারে না, ভেবে পায় না কি করবে, কোথায় যাবে। ঘরের সবগুলো দেয়ালের চেহারা ও হাবভাব আগেই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। ধমকানো এবং শাদা ভয়ের ছাপ মারা এমন সব অনড় আয়না যাতে কখনো কারো প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে না। বাঞ্ছারামপুরের খানে মোড়া রানিফুফুর কথা মনে হয়। এক ফুৎকারে নিভে যাওয়া নির্বিকার মোমবাতি, ঘুমের ঘোরে খিলখিল করে হাসে। গরম হাওয়ার হলকা চোখে ছোবল মারে বলে এই সময় জানালায় দাঁড়াতেও অনুর তেমন ভালো লাগে না। ঝিমিয়ে পড়া গুলবড়ি গাছ, ঝলসানো কাক ও অন্যান্য পাখির ডাক, তপ্ত হাহা হাওয়া, সবকিছু গনগনে উনুনে পোড়া রুটির মতো চিমসে গন্ধে ভরিয়ে রাখে। লামাদের বাগানে বাতাবি লেবুর কোপের পাশে আচ্ছন্ন ছায়ায় পাড়া-বেপাড়ার দস্যুরা পাঁচিল ডিঙিয়ে এই সময় ব্রিং খেলে, জানালায় দাঁড়ালেই সব দেখা যায়। (মাহমুদুল ২০০৯: ৯)

উপর্যুক্ত অংশে অনুর একাকিত্ব, স্মৃতিকাতরতা ও অস্থিরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনু কিশোর, কিন্তু তার চারপাশের জগৎ বয়স্কদের জগৎ, যে বয়স্করা তার মনের নানা অস্বস্তির কারণ। অনুর বাবা ঘরের মালিক, অনু এবং অনুর মা দুজনেই সেই মালিকের অধীন। উপন্যাসে সমস্যা ও সংকটের প্রাথমিক কারণ হিসেবে দেখা দেয় ঘরের মালিক—অনুর বাবা। অনু ও অনুর মা দুজনের মধ্যেই লক্ষ করা যায় পলায়নপরতা। অনু পালিয়ে যেতে চায় বাবা-মা দুজনের আশ্রয় থেকে। মাকে সে ভালোবাসে, কিন্তু মায়ের কাছে পড়ে থাকলে তার পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয়—মা বাবার বৃত্তে বন্দি। আবার, অনুর মা পালিয়ে যেতে চায় তার স্বামী বা অনুর বাবার কাছ থেকে। দুজনের মধ্যকার পলায়নপরতা সমস্বভাবী না হলেও এর মূলে থাকে এক স্থায়ী অস্বস্তি। অনু তার জন্মদাতা বাবাকে ঘৃণা করে। সেই ঘৃণা অকারণ নয়, তার যৌক্তিক কারণও জানা যায়:

> অনু আব্বাকে সহ্য করতে পারে না। শয়তান মনে করে। ঘৃণা করে। ... আব্বা অনেক দূরের মানুষ, সুদূর হিমালয়ের ওপার থেকে উড়ে এসে বাড়ির প্রাঙ্গণের ঘোড়ানিম গাছে ভয়ঙ্কর ইচ্ছে নিয়ে জ্বলন্ত বাদুড় ঝুলে থাকলে যেমন মনে হবে। কালো স্যুটে মোড়া আব্বাকে তার অতিকায় বাদুড় মনে হয়। (মাহমুদুল ২০০৯: ১৫)

উপন্যাসটি ক্রমবিকশিত নগরজীবনে নর-নারীর সম্পর্কসূত্র উন্মোচনের পাশাপাশি গার্হস্থ্য সন্ত্রাসের জটিল রূপরেখা অঙ্কন করে। বাবা-মায়ের মানসিক দূরত্বের শিকার অনু মনে-মনে তার মায়ের পক্ষ নেয়। অনুর চোখ দিয়ে দেখা জীবনটাই উপন্যাসের মূল ক্ষেত্র। তাই এটি তার চিন্তনরূপ ও জীবনী।

অনুর পাঠশালা কেবল প্রচলিত ঘটনা বা কাহিনির জমাটবদ্ধ রূপভিত্তিক কোনো উপন্যাস নয়, এতে অনুর অন্তর্জাগতিক বিচরণই মুখ্য। অনুর মায়ের পরাধীন সত্তার জন্য দায়ী করা হয় অনুর বাবাকে। অনু মনে-মনে তার বাবাকে এমনই নেতিবাচক অবস্থানে নিয়ে যায় যে সেখানে তাঁর জন্য বিন্দুমাত্র প্রসন্নতা থাকে না। মাহমুদুল হক তাঁর এই কাহিনিতে আধুনিক নগরজীবনের এক নতুন ধরনের বিষাদভাষ্য নির্মাণ করতে চেয়েছেন। প্রচলিত বিশ্বাসকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে আপাত-অভিনব, কিন্তু সত্যিকার বাস্তবকে জায়গা ছেড়ে দিতে চান ঔপন্যাসিক। প্রচলিত বিশ্বাস, ঘর মানেই শান্তির নীড়—স্বামী-স্ত্রী ও একটি সন্তানের ছোট সংসারটার যে এমন বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠা সম্ভব তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু *অনুর পাঠশালায়* তা-ই ঘটে। উপন্যাসের শেষ দিকে এসে আকস্মিকভাবে ঘটনা ভিন্ন খাতে মোড় নিলে তার ফলে এক ধরনের নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়। যদিও অনুর মা-বাবার পনেরো বছরের সাংসারিক জীবনে তা প্রত্যাশিত নয়। দীর্ঘকালীন অসুখ আর অস্বস্তির পরিণাম যে-কোনো-না-কোনোদিন দৃশ্যমান হবেই তা প্রত্যাশিত। যে নাটকীয়তায় উপন্যাস সমাপ্তিমুখী তা একই সঙ্গে অনু, তার মা-বাবা এবং তার মায়ের ইংরেজি শিক্ষক—সবাইকে এক সূত্রে গেঁথে দেয়। ঔপন্যাসিক এই উপলব্ধির দিকে ইঙ্গিত করেন যে পাঠশালা মানেই সর্বদা শৃঙ্খলা, নিয়ম আর বিন্যাসের জগৎ নয়, সেখানেও ঘটতে পারে বিশৃঙ্খলা, দেখা দিতে পারে নৈরাজ্য এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে নিয়মকানুন। অনুর চিন্তনরেখা নানা পথ পেরিয়ে এসে তারই পাঠশালায় অনিয়মের অমোচনীয় ছাপ রেখে যায়। পরিণতিটি আকস্মিক মনে হলেও মনে হয় না অস্বাভাবিক। অনুর এ পরিণতির অবশ্য থাকে একটি দীর্ঘ ইতিহাস। অনুর বাবা একদিনেই অনুর চেতনায় প্রতিনায়কে পরিণত হন না, এর পেছনে অনুর মায়ের সক্রিয় ভূমিকাটিও বিবেচনাযোগ্য। তিনি অনুকে বোঝান, তার বাবা আসলে 'খুনিদের সর্দার' এবং চোর-ডাকাতেরা সবাই টিকে আছে তাঁরই কল্যাণে। তাছাড়া লুটতরাজ আর মানুষ খুন-করা লোকদের টাকায় ফুলেফেঁপে উঠেছে অনুর বাবার সম্পদের বোঝা। তাই অনুর মা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে চান। এ থেকে বোঝা যায় অনু, তার মা ও তার বাবার পারিবারিক সম্পর্কের অবস্থান কখনও একরৈখিক ছিল না। অনুর বাবা মানুষ হিসেবে কতটা খারাপ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনু যতটা না অর্জন করেছে তার নিজের চেতনা দিয়ে, তারও অধিক সে লাভ করেছে তার মায়ের কথকতার মাধ্যমে। অন্তঃপুরের এমন আপাত-শান্ত পৃথিবীর মধ্যেও যে তীব্র ঝড় আর দুর্যোগের ঘনঘটা সম্ভব, সেই ইঙ্গিত দেয় *অনুর পাঠশালা*। অনুর মানসিক অবস্থা বোঝাতে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেন:

> অনু শিউরে ওঠে। বুকের মাঝখানে কাচের নীল পিরিচ ভেঙে খান-খান হয়ে যায়। মা'র যাবতীয় সুন্দর অভিলাষগুলো নির্দয় পাথরে পরিণত। এই বাড়ি ছেড়ে শয়তানের এই থাবা থেকে আর কোনোদিন নিরাপদে পালানো যাবে না। ভয় হয়। তবু এতো ভালোবাসে সে মাকে যে প্রতি মুহূর্তেই উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করে, রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে নির্বোধ শিশুর মতো বিছানা হাতড়ে কি যেন খোঁজে। তার কেবল ভয়, চিরকালের মতো এক দুর্জেয় অন্ধকারে একে একে সব মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। মায়ের সব ইচ্ছেগুলো যদি নির্দয় পাথর হয়ে গিয়েও থাকে তবু মনে মনে অনু সেই পাথরটা কেটে টেবিলের ওপরে সাজানো ভাঙা যিশুখৃস্টের মূর্তির চেয়ে অনেক সুন্দর তার রূপ দিতে চেষ্টা করে। (মাহমুদুল ২০০৯: ১৮-১৯)

নিঃসঙ্গ অনুর ভীতি, সঙ্গহীনতার বেদনা, বাবার সঙ্গে দূরত্ব এবং ক্রমে নিজের মধ্যে একা হয়ে যাওয়ার নানা-রূপ বাস্তবতা মাহমুদুল হকের ভাষায় পরিবেশানুগ আবেদন জাগিয়ে তোলে।

বহতা নদী যেমন আকস্মিক ঝড়ে কূলপ্লাবী হয়ে অকল্পনীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি অনুর মনোজগতের নিজস্ব পাঠশালায়ও একদিন জাগে প্রচণ্ড তোলপাড়। মা-বাবার বাদানুবাদ তীব্র বিবাদের সৃষ্টি করলে অনু জীবনে প্রথমবারের মতো তার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়। 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' বলে সে চিৎকার করে তার বাবার প্রতি ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেখানেই শেষ নয়, অনুর ছোড়া ক্রিস্টালের ভারি শিশির আঘাত তার বাবার কপালে রক্তপাত ঘটিয়ে দেয়। যদিও নিজের কাজ অনুর মধ্যে মুহূর্তেই অনুশোচনা জাগায়, তার মনে হয় তার বাবা নন, 'যুগ-যুগান্তরের পর আজ সে নিজেই ভয়ানক দুঃখে ভয়ানক যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে।' (মাহমুদুল ২০০৯: ৮০)

বেদনার মধ্য দিয়ে অনুর বৃহৎ প্রাপ্তির আকুলতা আরো গাঢ়তা লাভ করে। সরুদাসী অনুর সেই প্রাপ্তির প্রতীক। ঋষিপাড়ার কিশোরী সরুদাসী অনুর মনের সেই অংশের ছায়া যে মনে-মনে অবাধ-উন্মুক্ত এক জীবনের প্রত্যাশী। সরুদাসী বয়সে তার চেয়ে সামান্য বড়ো হলেও অভিজ্ঞতায় সে অনুর চাইতে অনেকটাই এগিয়ে। ঋষিপাড়ার দরিদ্র অথচ কোলাহলময় বৃত্তের বাসিন্দা সরুদাসী প্রতি মুহূর্তে বহমান জীবনের তরঙ্গে দোলায়িত। সে তাই অনুর অন্তর্জগতে সেই পৃথিবীর প্রতিনিধি—যে পৃথিবী অনেক জানা আর অনেক দেখার সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ। মা-বাবার সংঘাতময় অভিজ্ঞতার সাক্ষী এবং স্বয়ং অংশগ্রহণকারী অনুর মধ্যে সরুদাসীকে অন্বেষণের চেষ্টা সন্ত্রাসমুক্ত সহজ জীবনানন্দকে পাওয়ারই চেষ্টা। যে কিশোরের জীবনটা তখনও কেবল আরম্ভের অপেক্ষায়, সে জীবনটা প্রবলভাবে বিষময় হয়ে ওঠে পরিবার-সমাজের অপরিণামদর্শিতা ও দায়িত্বহীনতার কারণে।

অনুর পাঠশালা উপন্যাসের শিল্পপরিচর্যায় গভীর জীবনবোধের আবেদনকে অস্বীকার করা যায় না। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাব হয়ে দাঁড়ায় শৈশব—শিশুকালই এখানে দুঃখ-আনন্দ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং স্বার্থ-পরার্থের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটায়। অনুর কাছে ঋষিপাড়া একটা ইতিবাচক গন্তব্য। যেহেতু জীবনের অর্থনৈতিক অপূর্ণতার কার্যকারণ সম্পর্কে তখনও সে জ্ঞাত নয়, ঋষিপাড়ার দারিদ্র-অভাবের জীবনও তার কাছে চেনা নয়। তার মন চেয়েছে একটা শান্ত হ্রদের জীবন—চিরক্রীড়াময় একটা জায়গা। যখনই সে তার মা-বাবার পরিবারে ঢোকে তখনই তার বহির্মুখী মন সক্রিয়তা পেতে থাকে আর যখন সে বাইরে বেরোয় তখন তার নিরুদ্দেশের ভাবনা হয় গাঢ়তর, যদিও:

> অনুর এই যে নিরুদ্দেশ তা আর বাস্তবে ঘটল না। স্বপ্নে অনু গেল এক নিরুদ্দেশের পথে। এর পথে কত চরিত্র, একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকের সেই প্রকৃতির পাঠশালায় নতুন এক শিক্ষাবিদের মতো অনু, কত যে কিছু অমূল্য সম্পদ কুড়িয়ে নিচ্ছে তার মনের ঝুড়িতে। সেই সঙ্গে অদ্ভুত এক পরিবেশ। অনুকে নিয়ে নিপুণ ভাষায় যে-পরিবেশ তৈরি করেছেন তাঁর এই আখ্যানে কথাকার মাহমুদুল হক তা এক কথায় অসাধারণ। এই আখ্যানে অনু

> থেকে স্বপ্নে কুড়িয়ে নেওয়া সরুদাসী তাদের অন্তর্জগতের উন্মোচন ঘটাতে ঘটাতে একসময় তাই বাস্তবের মানুষ হয়ে ওঠে। (শচীন দাশ ২০১৪: ১৩২)

অনুর মনের এসব আলোছায়া বা স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের বোধ নিয়ে তার মা-বাবার মধ্যে বিশেষ কোনো মনোযোগ লক্ষ করা যায় না। বিদীর্ণ আর একঘেয়ে দুপুরে পারিবারিক সন্ত্রাস থেকে মুক্তির প্রতীক হয়ে যায় খোলা জানালার ওপারের জীবন, যে জীবনের হাতছানিতে অনু হয়ে যায় অমল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *ডাকঘরের* (১৯১১) অসুস্থ অমল দইওয়ালার গাঁয়ে না গিয়েও ঠিকঠিক বলতে পেরেছিল কেমন লালমাটির পথ দিয়ে যেতে হয় দইওয়ালার গ্রামে। *মেঘদূতে*র আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'বন্দীহৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ'। কালিদাস (আনু. পঞ্চম শতক) যক্ষের বরাতে মেঘের ডানায় চড়িয়ে চিরসুন্দর পথ পাড়ি দিয়ে পাঠককে নিয়ে গেছেন অলকাপুরিতে। সেখানে যক্ষপ্রিয়ার সামনে পৌঁছামাত্র পাঠকের মোহমুক্তি ঘটে, তারা বুঝতে পারে তারা আসলে মেঘের সঙ্গে রামগিরি পর্বতেই আছে যেখানে যক্ষ নির্বাসিত—অনুনয় করছে মেঘকে বার্তাবাহক হতে (কালিদাস, ১৯৬০)। কালিদাস যেমন কল্পনার মাঝেই পাঠকদের অলকাপুরি ঘুরিয়ে এনে ফেরত পাঠান রামগিরির বাস্তবতায়, অনেকটা তেমন করেই *অনুর পাঠশালায়* ঘটে পাঠকের কাল্পনিক বিচরণ—পাঠক বুঝতে পারে অনুর পাঠশালার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। পারিবারিক জটিলতায়, অগ্রসর সমাজের বিপরীতে থেকে, নিদারুণ নিঃসঙ্গতায় ভুগতে থাকা এক কিশোর তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট জগতেই হয়তো তৈরি করেছিল তার অধিবাস্তব জগৎ, যে জগতে সরুদাসী কথায়-কথায় ছড়া কাটে, তার কাছ থেকে মিছরি খেতে চায়। তাকে ভালোবাসাযুক্ত বিভিন্ন নাম ধরে ডাকে। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পাতায় লেখক উন্মোচন করেন যে সবকিছুই ঘটছে অনুর মনোজগতে। এখানে তিনি ঘোরের রাজ্য থেকে আচমকা অনুকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন কঠোর বাস্তবের সামনে। এ অংশ অনুর কাছে তার চেনা পৃথিবীর বাইরে বীভৎস এক গ্রহান্তর। অনুর মনস্তত্ত্ব প্রকাশে করতে মাহমুদুল হক বর্ণনা করছেন:

> বৃদ্ধ হরিয়া পাখোয়াজ বাজাচ্ছে—খুব জোরে বাজাচ্ছে বুড়ো হরিয়া। আগের চেয়ে জোরে, আরো মাথা নেড়ে, বাবরি ঝাঁকিয়ে, এ-হেহ-আই হাঁক ছেড়ে, ধোঁয়াচ্ছন্ন এক কুহক থেকে ঘুটঘুটে করাল আরেক কুহকে উন্মাদপ্রায় যাত্রারম্ভ করেছে সে। পাখোয়াজের গায়ে প্রতিটি চাঁটির ভেতর সাবধান সাবধান ধ্বনি চড়বড়িয়ে উঠছে। রণোন্মত্ত হস্তিযুদ্ধকে দাবড়ে দিচ্ছে সে। হাতের চাঁটি এবং পাখোয়াজের উদ্ধত ধ্বনি এবং ঘনঘন এ-হেই-আই-ও-হুঁহ ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে চলেছে। অভিশপ্ত ভূগর্ভের কালো খোল ফেটে পিচকারির মতো তীব্রভাবে উদ্‌গীরিত হচ্ছে সেই মদোন্মত্ত ধুপধাপ শব্দলহরী। চিড় খাচ্ছে আর দুড়ুম-দাড়াম করে সেখানে স্থানচ্যুত হচ্ছে কঠিন শিলান্তর, উত্তপ্ত এবং লেলিহান অগ্নিশিখার মতো হলহলিয়ে উঠছে প্রচণ্ড এবং ক্রোধান্ধ তুমুল শব্দরাজি; সাবধান এবং ধ্বংস এবং বস্ত্র এবং মাতঙ্গ এবং গাড়িব এবং ব্যাঘ্র এবং হলাহল এবং সিংহ এবং ভুজঙ্গ এবং বৃষ এবং খড়্গ প্রস্তুত শব্দাবলি সেই দুর্দম অগ্নিশিখার মাঝখানে আতসবাজির মতোই মুহুর্মুহ ফেটে পড়ছে। অনুর মনে হলো বুড়ো হরিয়ার হাতের এই প্রলয়ঙ্কর পাখোয়াজ নিঃসৃত শব্দবাণে পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যতা ভেঙে চুরমার, খানখান হয়ে যাবে। রক্তবৃষ্টি। মাংসবৃষ্টি। অগ্নিবৃষ্টি। রক্তমাংস অগ্নিবৃষ্টি! (মাহমুদুল ২০০৯: ৯১)

শেষাংশের এই বর্ণনায় এক সুররিয়েলেস্টিক ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে অনুর ভাবনার জগতের পতন অনুভূত হয়। এই উপন্যাসে অনুর মনস্তত্ত্ব নির্মাণে লেখকের দক্ষতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবু হেনা মোস্তফা এনাম লেখেন:

> কাহিনি এখানে নিতান্তই গৌণ, কাহিনি যা বিদ্যমান তাও ঘনসন্নিবদ্ধ নয়; কিন্তু পূর্ণ করে তুলেছেন ভাষার সূক্ষ্মতায়। তাছাড়া এই উপন্যাসের আখ্যান পরিকল্পনায় তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন ফরাসি 'দেজা ভু' তত্ত্বের। 'দেজা ভু' (Deja vu) ফরাসি এই শব্দসমষ্টির অর্থ 'পূর্বেই দেখা'। অর্থাৎ কোনও ঘটনা সংঘটনের পর রহস্যময়ভাবে এই বোধ সঞ্চারিত হয়—ঘটমান পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা যেন পূর্বঘটিত। যেমন প্রাচীন অচেনা কোনো ভবনে প্রবেশের পর অকস্মাৎ মনে হতে পারে ইতঃপূর্বে তিনি এখানে এসেছিলেন। অনেকে 'দেজা ভু'কে পূর্বজীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার সমষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। হয়তো আক্ষরিক অর্থে অনুর পাঠশালা-র গৌণ কাহিনিটিকে 'দেজা ভু' তত্ত্বের ছকবন্দি করে ফেলা যাবে না। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনির পর্ব ও পর্বান্তরে পুরোনো কালের ভবনে যে নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা উন্মুখ হয়ে রয়েছে, সেখানে একদিকে আখ্যান নির্মাণের প্রেক্ষাপট, অনুর ক্রমরূপান্তরশীল মনস্তত্ত্ব, অন্যদিকে উপন্যাসটির আঙ্গিক-প্রকৌশল উল্লিখিত ফরাসি শব্দযৌগের প্রতি আমাদের উৎসাহী করে তোলে। (২০১৬: ৩৫)

উপন্যাসটি শেষ হয় এক ধরনের হাহাকার ও শূন্যতাবোধের আমেজ ছড়িয়ে। অনুর এই বেদনাঘন পরিণতির মধ্যে অগ্রসর সমাজের মধ্যকার অপূর্ণতার দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে উপন্যাসটির শেষ আমাদের নিয়ে যায় উপন্যাসের শুরুতে। লেখক বিনয় মজুমদারের (১৯৩৪-২০০৬) একটি কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন:

> স্বপ্নের আধার, তুমি ভেবে দ্যাখো, অধিকৃত দুজন যমজ
> যদিও হুবহু এক, তবু বহুকাল ধরে সান্নিধ্যে থাকায়
> তাদের পৃথকভাবে চেনা যায়, মানুষেরা চেনায় সক্ষম।
> এই আবিষ্কারবোধ পৃথিবীতে আছে বলে আজ এ-সময়ে
> তোমার নিকটে আসি, সমাদর নেই তবু সবিস্ময়ে আসি। (মাহমুদুল ২০০৯: পৃষ্ঠাঙ্কবিহীন)

এই পঙ্‌ক্তিগুলো হয়তো পাঠকের প্রতি অনুর দ্বৈতসত্তার ইঙ্গিত রেখে যায়, কিন্তু এরা রবার্ট লুইস স্টিভেনশনের (১৮৫০-১৮৯৪) অণু-উপন্যাস *স্ট্রেঞ্জ কেইস অব ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইডে*র (১৮৮৬) ডাক্তার জেকিল ও মিস্টার হাইডের মতো পরস্পরবিরোধী সত্তা নয়। এরা দেখতে হুবহু এক হলেও আলাদা এবং আলাদা হয়েও এরা পরস্পরের সম্পূরক। এই অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের বিষামৃতের তীব্রতায় এক অনন্যসাধারণ চরিত্র অনু। পরিচয় লুকিয়ে একই অনু বারেবারে নতুন-নতুন পাঠশালায় পাঠ নিতে যায়, পরিচয় প্রকটিত হলে সে অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষিত হয়। তবু নিঃসঙ্গ শৈশবে আরাধ্য স্বপ্নভূমিতে অনুরা সবিস্ময়ে ফিরে ফিরে আসে।

মাহমুদুল হকের উপন্যাস-শিল্পের মনস্তাত্ত্বিক ধারার দ্বিতীয় উপন্যাস *কালো বরফ* (১৯৯২)। ১৯৭৭ সালে রচিত উপন্যাসটি তাঁর প্রথম উপন্যাস *অনুর পাঠশালা*র বিপরীত মেরুর দৃষ্টিকোণকে ধারণ করেছে। *অনুর পাঠশালায়* অনুর কিশোর মনস্তত্ত্বের উত্তল-অবতল আয়নায়

জীবনের এক কদর্য-নিষ্ঠুর ছায়াপাত লক্ষ করা গেছে। পক্ষান্তরে *কালো বরফে* পূর্ণবয়স্ক ও জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় স্নাত ব্যক্তিমনের উদ্‌ঘাটন ঘটেছে। একজন কথক, আব্দুল খালেক যার নাম, সাতচল্লিশের দেশভাগের শিকার হয়ে পূর্ববাংলায় তার আগমন ও বসবাস। একসময়ে সে ভাবত, যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের শিকার হয়ে তাকে দেশ ছাড়তে হয় তার জন্য কোনো বিশেষ একটি সম্প্রদায়ই দায়ী; কিন্তু পূর্ববাংলায় এসে সেখানেও সে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতার অভিজ্ঞতা লাভ করে। ফলে জীবনের প্রতি, জগতের প্রতি এক ধরনের বীতরাগ স্থায়ী দাগ কেটে যায় তার মনে। তার পেশা কলেজে শিক্ষকতা, কিন্তু সেখানেও তার মন বিরূপতাপূর্ণ থাকে। সমগ্র উপন্যাসে আব্দুল খালেকের মানসিক অবস্থার একটা পরিপূর্ণ অবয়ব আঁকার চেষ্টা করেছেন মাহমুদুল হক—একটি কিশোরের কৈশোরের আনন্দপূর্ণ উদযাপনে যার সূচনা এবং জীবনের পরিণত স্তরে এসে দুঃখবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে তার পরিণতি। *অনুর পাঠশালায়* অনুর অস্থিরতা তার সত্তার চিরসঙ্গী, *কালো বরফে* আব্দুল খালেকের চিরসঙ্গী হলো অস্বস্তি। অস্বস্তি বরাবর একটি নেতিবাচক উপলব্ধি, তাই উপন্যাসটি এক মনস্তাত্ত্বিক অপূর্ণতার চিত্র-উন্মোচনকারী। তবে উপন্যাসের শেষদিকে আমরা দেখতে পাই, আব্দুল খালেক তার অন্তর্গত অস্বস্তিকে উতরে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও স্বস্তি নামক প্রণোদনাকে পেতে চেয়েছে।

কালো বরফের কাহিনি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। এর শিল্পনির্মিতিতে আত্মজৈবনিকতার স্পর্শ উপন্যাসের নায়ককে সর্বজ্ঞ একটি সত্তায় পরিণত করেছে। ডায়েরিতে লেখা তার কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে পাঠক ধরে নেয়, কারণ দেশবিভাগের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসটিতে আব্দুল খালেকের জীবনও প্রবাহিত হয় বিচ্ছিন্নতার খাতে। ইতিহাসের অন্তঃপ্রবাহে যে বেদনা সঞ্চারিত, সে তারই ধারক। মাহমুদুল হক ইতিহাস-সমকাল ইত্যাদি পরিপ্রেক্ষিতকে ব্যবহার করে ব্যক্তির অন্তর্জাগতিক উন্মোচনের সূত্রে একক ব্যক্তির মাধ্যমে সমষ্টির চেতনাকে স্পর্শ করেছেন। উপন্যাসের দুটি সমান্তরাল রেখায় বর্ণিত আব্দুল খালেকের দুই জীবনের কাহিনি। দুটি রেখা শেষে একটি রেখায় এসে মিলিত হয় যেখানে আব্দুল খালেক তার প্রথম জীবনের বা তার ফেলে আসা জীবনের বৃত্ততেই জীবনের সমস্ত ব্যঞ্জনাকে অনুভব করতে বদ্ধপরিকর। সে তার বাস্তবের দুঃখকষ্টের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে তার এক জীবন থেকে অন্য জীবনে ছিটকে আসার ঘটনাকে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ *কালো বরফের* একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত হলেও ঔপন্যাসিক বিষয়টিকে ব্যক্তির অন্তর-চেতনার সারসত্তা হিসেবে দেখেছেন। ব্যক্তির যে চেতনালোক তার শৈশব থেকে গড়ে ওঠে, তার পরবর্তী জীবনেও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কিন্তু তা ক্ষুণ্ন হলে বা ক্ষতির শিকার হলে তার পরিণামে ব্যক্তির মনে দেখা দেয় অস্বস্তি। সেই অস্বস্তি স্থায়ী রূপ নেয় ব্যক্তিকে তার মৌল সত্তায় আঘাত করার মাধ্যমে।

কালো বরফ ব্যক্তিচেতনার ক্রমরক্তক্ষরণের কাহিনি। অবিভক্ত বাংলার বারাসাত জেলার গোবরডাঙায় আব্দুল খালেকের জন্ম ও শৈশব অতিবাহিত হয়। অদ্ভুত একটা ডাক নাম তার—পোকা। পোকা খুব সাধারণ নাম হলেও এটি এক ক্ষুদ্র সত্তার প্রতীকী রূপ। অথচ এই ক্ষুদ্র সত্তাই সারাজীবন আচ্ছন্ন করে রাখে আব্দুল খালেককে। সবাই তাকে চেনে তার পোশাকি

নাম 'আব্দুল খালেকে'র সূত্রে। কিন্তু যাদের কাছে সে 'পোকা' নামের চেনা মানুষ তাদের কাছে সে একই সঙ্গে গোবরডাঙারও। ফলে পোকা আর গোবরডাঙা বা বারাসাত একাকার হয়ে যায়। মাহমুদুল হক পোকা বা আব্দুল খালেককে তার এই আচ্ছন্নতা ও ঘোরের মধ্যে রেখে দেন। তাকে সেই আচ্ছন্নতা থেকে বেরোনোর প্রশ্নেও ঔপন্যাসিক অনেকটাই নির্বিকার। এই আচ্ছন্নতা ও নির্বিকারত্ব আব্দুল খালেক চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রী রেখা ও সন্তান টুকুকে নিয়ে তার সংসারযাপনও তার চরিত্রটিতে যথেষ্ট সক্রিয়তা এনে দিতে পারে না। মাহমুদুল হক আব্দুল খালেকের চরিত্রটিতে এক ধরনের অস্তিত্বের সংকট তৈরি করে দেখান। যারা রাজনীতির মানুষ, যারা অনেকের দৃষ্টিতে ক্ষমতাধর, যাদের ইশারায় নির্ধারিত হয়ে যায় অসংখ্য মানুষের ভাগ্য-ভবিতব্য, তাদের চেতনায় হয়তো আব্দুল খালেকের সমস্যা-সংকট নিরর্থক প্রসঙ্গ, কিন্তু সংবেদনশীল সামাজিক প্রতিনিধি যারা, তাদের কাছে এই সংকটের গুরুত্ব অনেক। আব্দুল খালেকের চারিত্রিক নিষ্ক্রিয়তা তাকে সমাজ-সংসারে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় তার ফলে সে জীবনের অগ্রসরমানতার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ে। সেই পশ্চাদপদতার প্রভাব পড়ে তার নিজের ব্যক্তিজীবনেও। তার মানসিক জগৎ সংকটহীন, সংকটের অভিজ্ঞতাহীন ও সংবেদনহীন মানুষের জগতের চেয়ে আলাদা। বিবাহিত জীবনে এই মানসিক সংকটের পরিণাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে জাগিয়ে তোলে অস্বস্তি। সেই অস্বস্তির প্রতিক্রিয়ায় স্ত্রী রেখা আব্দুল খালেকের প্রতি বিরক্ত ও হতাশ হতে থাকে ক্রমশ। ব্যক্তিগত চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সামাজিক স্তরে প্রসারিত হতে থাকে পোকা ওরফে আব্দুল খালেকের সত্তার গভীরে থাকা বিচ্ছিন্নতা। তার মধ্যে জন্ম নেয় অপরিসীম এক শূন্যতার বোধ:

> সেসব কত কথা। ইচ্ছে করলেও এখন আর সব মনে পড়ে না। কত কথা, কত চার ভাঁজ করা ছবি, তেশিরা কাচ, লালকুঁচ, কত সকাল-দুপুর-বিকেল বোকার মতো হারিয়ে ফেলেছে পোকা! কখনো মনে হয় নি, একদিন সবকিছুরই আবার খোঁজ পড়বে নতুন করে। বড় অবহেলা ছিল পোকার, বড় অবহেলা। অযত্ন আর হেলাফেলায় কতো কিছুই যে সে হারিয়ে ফেলেছে! জিনজার এখন গানের মতো বাজে, হিনজার এখন বুকের ভেতরে নিরবচ্ছিন্ন শব্দ তোলে। হু হু বাতাসের গায়ে নকশা-তোলা ফুলের মতো অবিরল আকুলতা, পোকার বুকের ভেতরের ফাঁকা দালানকোঠা গুম গুম করে বাজে, পোকা তুই মর, পোকা তুই মর! যা কিছু নিঃশব্দ, যা কিছু শব্দময়, যা কিছু দৃশ্যগোচর, দৃশ্যাতীত, সবকিছুই একজোট হয়ে হাত ধরাধরি করে ঘিরে ধরে; অদ্ভুত এক বাজনার তালে তালে আস্ত একটি রাত মোমের মতো গলে পড়ে, জিনজার-হিনজার জিনজার-গিনজার, জিনজার-হিনজার পোকা শোনে, শুনতে পায়। পোকা পোকা হয়ে যায়। (মাহমুদুল ২০০০: ৩৮)

এই পোকা যেন ফ্রানৎস কাফকার (১৮৮৩-১৯২৪) গল্প 'মেটামরফোসিসে'র (১৯১৫) গ্রেগর সামসা। কাফকার সামসা, আলবেয়ার কামুর (১৯১৩-১৯৬০) উপন্যাস *দ্য প্লেগের* (১৯৪৭) রিও, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) উপন্যাস *পুতুল নাচের ইতিকথার* (১৯৩৬) শশী আর *কালো বরফের* আব্দুল খালেক আমাদের চেতনালোকে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়: 'ম-এ মুসলমান, ম-এ মুর্দফরাস, ম-এ মুচি সব সমান' (মাহমুদুল ২০০০: ৩৫)। অস্তিত্বের

টানাপড়েন আর জীবনের নানান জটিলতায় অবরুদ্ধ আব্দুল খালেকের ভিটেমাটি ত্যাগের বেদনাবোধ তাকে নিক্ষেপ করে এক গভীর শূন্যতায়:

> আব্দুল খালেক ওরফে পোকাকে বিমুগ্ধ শৈশবেই বিরূপ বাস্তবের পোকার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হত হয়েছিল। সে পোকার কামড়ে তার সত্তার একেবারে গভীরে যে দগদগে ঘার সৃষ্টি হয়, সেটি কোনোদিনই শুকোয়নি। বাস্তবের রাক্ষুসে পোকাটির নাম পার্টিশন বা দেশবিভাগ। (যতীন সরকার ২০১০: ৭৮)

এখানে লক্ষ করা দরকার, ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হলেও *কালো বরফ* উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৭৭—১৯৪৭-এর দেশবিভাগ থেকে ঠিক ত্রিশ বছর পর। সেই সময়কালও এক দিক থেকে অর্থপূর্ণ—অবরুদ্ধতার প্রেক্ষাপট বিস্তৃত চারদিকে। স্মৃতি ও বর্তমান—দুটিই উপন্যাসের নায়ক পোকা অথবা আব্দুল খালেকের জন্য অস্বস্তিকর। তাই উপন্যাসের শেষাংশ বা পরিণতিকে বলা যায় তার মানসিক নিষ্ক্রমণের প্রস্তুতি। জীবনের সমস্ত রুদ্ধতা আর নেতি থেকে যখন বেরোনোর সকল পথ বন্ধ, তখন আব্দুল খালেকের উদ্যোগ একটি ক্ষুদ্র পথ রচনার চেষ্টায় দৃশ্যমান হয়। স্ত্রী রেখা আর বন্ধু নরহরি ডাক্তারকে নিয়ে মরণ ঢালির নৌকায় করে নদীভ্রমণ আব্দুল খালেকের নিরুদ্দেশ-বিহারী মনের একটি প্রতীকী পরিণতি। মানুষের বৈরিতায় গড়া মাটির পৃথিবীতে অর্থাৎ স্থলভাগে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে বলে আব্দুল খালেকের জলযাত্রার আয়োজন। তাছাড়া এই নদী তার স্মৃতিপথে দেশ ছেড়ে আসার বেদনারও স্মারক। সে যখন নৌকা থামিয়ে স্ত্রী রেখাকে নিয়ে একান্তে একটি কোণ রচনায় মগ্ন, তখনও তার স্মৃতিতে ফিরে আসে তার বারাসাত, তার গোবরডাঙা, তার শৈশবযুগই। শৈশবে দেখা মাধুরী আর নগেন স্যাকরার জীবন থেকে সে শিখেছিল প্রেমের সংজ্ঞা। সেই সংজ্ঞাই সে মনে ধারণ করে রেখেছে জীবনভর। তাই রেখাকে ভালোবাসতে গিয়ে, অন্তর্নিহিত প্রেমকে আবার জাগিয়ে তুলতে গিয়েও সে বর্তমান থেকে সরে গিয়ে ফেলে আসা জীবনের কোণে আশ্রয় নিতে চেয়েছে। আসলে বর্তমানে এলেই আব্দুল খালেকের মনে হয় যেন তার জীবনটা তছনছ হয়ে গেছে। সে চায় জীবনকে অক্ষুণ্নরূপে পেতে, কিন্তু তার জীবনটা কেবলই জোড়াতালিতে ভরে ওঠে। শৈশবের মাধুরী আর মা এবং তারপর তার মা আর রেখা—এই চিত্রপটে আসে বসুন্ধরা বা পৃথিবী, নিজের পৃথিবী বা জন্মভূমি, তাই মায়ের কথাই আব্দুল খালেকের মনে পড়ে সেই আশ্রয়-অন্বেষণকালেও:

> মা বলতো তাই বলে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে অজানা এক দেশে আমাদের থাকতে হবে। এটা কোন কথা। আমি কোথাও যাবো না, মরতে হলে এইখানেই মরবো, কপালে যা থাকে তা হবে। (মাহমুদুল ২০০০: ১২৬-১২৭)

মায়ের এই কথার জন্য আব্দুল খালেকের পাওনা হতো তার বাবার বকুনি। একইভাবে আব্দুল খালেকের ভাগ্যে জোটে তার স্ত্রী রেখার বকুনি। আব্দুল খালেকের ভাই মনি; তারও একদিন সেই দেশভাগের ফলে রচিত হয়েছিল প্রেমের সমাধি। দেশ ছেড়ে আসার সময়ে তার ভালোবাসার মানুষ ছবির একখানা চুলের কাঁটাই ছিল তখনকার মতো তার জন্য জীবনের চেয়ে দামি সম্পদ। মনি ছবিকে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশ ছেড়েছিল, কিন্তু তা আর

বাস্তবে রূপ নেয়নি। পোকার মাকেও দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল। আব্দুল খালেককে এই সমস্ত বেদনা সরিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টায় উদ্যোগী হতে দেখা যায়—নৌপথে নৌকাভ্রমণ তার সেই প্রচেষ্টা। সেটা তার একটা নতুন বাঁকের দিকে এগোনোর প্রস্তুতি। নদী তার চিরভঙ্গুর মনে আপাত-উপশম জোগালেও বাস্তবে আব্দুল খালেকের সত্তার জখম-অবস্থার কোনো শুশ্রূষা হয় না। শরীরের ক্ষত চিকিৎসায় নিরাময় সম্ভব, কিন্তু মনের ক্ষতের নিরাময় সম্ভব নয়। একটি মনস্তাত্ত্বিক সংবেদনার দৃষ্টিকোণ থেকে *কালো বরফ* একটি বিশেষ কালের ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতির ভাষ্য হয়ে উঠেছে।

সমকালীন জীবনের বাস্তবতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দেখলে আব্দুল খালেকের চেতনার মর্ম উপলব্ধি করা যাবে। সমকালের বৈরিতা ব্যক্তির চেতনাকে কীভাবে আক্রান্ত ও পঙ্গু করে দেয় তা-ই *কালো বরফ* উপন্যাসের মূল বিষয়। ঔপন্যাসিক ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আবিষ্কার করেছেন এখানে।

ঔপন্যাসিক আব্দুল খালেকের সূত্রে উপন্যাসের ঘটনাসংস্থানকে যেভাবে দৃঢ়-সংবদ্ধ উপায়ে এগিয়ে নেন, তাতে পোকার অথবা আব্দুল খালেকের সত্তার সংকটটি যৌক্তিক কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত হয়। ইতিহাসের রাজনীতি বা সমাজনীতি যা-ই হোক না কেন মাহমুদুল হক সেটিকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। আবার, একইসঙ্গে আব্দুল খালেকের মধ্যে সংকটের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তির অনুভূতিও লক্ষ করা যায়। সেই সম্ভাবনার দিকে উপন্যাস পরিণতি খোঁজে এবং মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে জীবন থেকে যে ইতিবাচকতাই খুঁজে পেতে চায়, সেটাকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে আব্দুল খালেক।

মাহমুদুল হকের মনস্তাত্ত্বিক ধারার উপন্যাসে ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে বৃহৎ। কাহিনির দৈর্ঘ্য অথবা চরিত্রের সংখ্যা এ ধারার উপন্যাসের মুখ্য দিক নয়। জীবনবোধের গভীরতার অভিব্যক্তি ব্যঞ্জিত করাই এ ধরনের উপন্যাস বা শিল্পসৃষ্টির লক্ষ্য। বিশ্বসাহিত্যেও এ রকম উপন্যাসের নজির রয়েছে অনেক। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের (১৮৯৯-১৯৬১) *দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি* (১৯৫২) কিংবা ফ্রানৎস কাফকার *দ্য ক্যাসল* (১৯২২) এ জাতীয় উপন্যাস যেখানে পরিসরের ক্ষুদ্রতা ও চরিত্রের স্বল্পতা সত্ত্বেও বৃহৎ জীবন ও জগতের ভাষ্য নির্মিত হয়েছে। হেমিংওয়ের উপন্যাসটিতে হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি চরিত্রই বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ববাস্তবতাকে অসাধারণভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। বুড়ো জেলে সান্তিয়াগোর মনোনিষ্কাশিত আত্মগত কথকতা কখনও স্বগতোক্তি আবার কখনও একাধিক চরিত্রের সংলাপের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলে। উপন্যাসের চারিত্রিক সংখ্যাল্পতাকে অতিক্রম করে যায় উপন্যাসকৃত সমকালীন ও প্রবহমাণ জীবনের পর্যবেক্ষণ-দর্শন। মাহমুদুল হকের এ ধারার উপন্যাসদুটির মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় ঐক্য। প্রথমত নিঃসঙ্গতার বোধ। প্রসঙ্গত জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) একটি কবিতার উল্লেখ করা যায় যেটিতে কবি যুগ-পরিবেশবিদ্ধ ব্যক্তির অন্তঃচেতনার দগ্ধতাকে প্রকাশ করেন:

> সকল লোকের মাঝে ব'সে
> আমার নিজের মুদ্রাদোষে
> আমি একা হতেছি আলাদা?

> আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
> আমার পথেই শুধু বাধা? (জীবনানন্দ ২০১৫: ৪৩)

জীবনানন্দ দাশ মাহমুদুল হকের চেয়ে অনেককাল আগে ব্যক্তির মনোজাগতিক বাস্তবতার এমন সংকটজনক পরিস্থিতিকে চিত্রিত করেন কালোত্তীর্ণ কবিতায়। তবে লক্ষ করার বিষয়, কবি যাকে ব্যক্তির 'মুদ্রাদোষ' বলছেন তা মাহমুদুল হকের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিচেতনার বিশেষত্ব। পরিস্থিতি বা পারিপার্শ্বিকতার গোলযোগের পরিণামে সৃষ্টি হয়েছে সেই বিশেষত্ব যা *অনুর পাঠশালা* উপন্যাসের অনুর মধ্যে এবং *কালো বরফ* উপন্যাসের আব্দুল খালেকের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা হয়ে দেখা দিয়েছে। অনুর চেতনার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে; তার চেয়েও বড়ো কথা, তার বিকাশের পথে হুমকি হয়ে এসেছে তারই জনক। একইভাবে আব্দুল খালেকের বিকশিত চেতনা বিক্ষত হয়েছে ভয়ংকর আঘাতে। সেই আঘাত হলো তার জন্মভূমির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ, যা সে কখনো মেনে নিতে পারেনি, পরিবর্তে সে তৈরি করে নিয়েছে নিজস্ব এক মনোজগৎ। সেখানেই সে থাকত সর্বদা বিচরণশীল। এই কৈশোরিক কল্পজগৎই তার প্রধান আশ্রয় হয়ে ওঠে। সে তার মনের ভেতরের চৌহদ্দিকে তার আদি-অকৃত্রিম আঘাতমুক্ত স্বরূপে বজায় রাখার জন্য প্রাণপণে সক্রিয় থেকেছে। সেই সক্রিয়তা হলো তার উদাসীনতা, তার বিষণ্ণতা ও তার স্মৃতিকাতরতা। সেই স্মৃতিকাতরতার এমনই শক্তি যা তার বর্তমানের স্মৃতিপুঞ্জের আবেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে তার সত্তাকে। অনুর প্রত্যাখ্যান প্রচণ্ডতার মাত্রা ছোঁয় পিতার প্রতি তার চরমপন্থা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। আব্দুল খালেকের জীবন-বিযুক্ততা, স্ত্রী রেখার সঙ্গে তার দূরত্ব-টানাপোড়েনকেও এক ধরনের প্রত্যাখ্যান বলা যায়—জীবনের চলমানতাকে যেনতেন প্রকারে আলিঙ্গন করে নেওয়াটাকে অস্বীকার করা। জীবনানন্দ দাশের কবিতার বিবিক্ত ব্যক্তিচেতনার মতো আব্দুল খালেকের অন্তরেও অব্যাখ্যেয় 'মুদ্রাদোষে'র উপস্থিতি স্বীকার করে নিতে হয়। অব্যাখ্যেয় তা সাধারণ দৃষ্টিসীমার কাছে, কিন্তু পাঠকের কাছে সে কারণ অজানা নয়। আবার, যে অনু তার শৈশবে এমন ভয়ংকর জীবনবিরোধী বৈরিতার মধ্যে বেড়ে ওঠে, তার মধ্যেও একদিন জন্ম নিতে পারে তেমনই এক 'মুদ্রাদোষ'।

জীবনবিরোধী পরিস্থিতি চেতনা বিকাশের পথে যে অন্তরায় সৃষ্টি করে তার পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। ব্যক্তি তার সত্তাকে প্রতিকূলতা থেকে বাঁচানোর জন্য সচেষ্ট হয় এবং তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ বলে প্রতিভাত হলে সে জীবন থেকে ক্রমশ সরে যেতে থাকে জীবনহীনতা তথা মৃত্যুর দিকে। জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতায় আমরা দেখি আত্মহত্যা প্রবণতার বিনাশী চিত্র। সত্তায় সৃষ্টি হওয়া বিচ্ছিন্নতার ভ্রূণ ক্রমপল্লবিত হয়ে ব্যক্তিকে নিয়ে যায় নির্বিকার আত্মধ্বংসের দিকে। অনু ও আব্দুল খালেকের মধ্যেও বিচ্ছিন্নতার ভ্রূণ তাদেরকে ক্রমশ এক জীবনবিমুখতার দিকে ঠেলে দিতে থাকে। কিন্তু ঠিক এখানেই মাহমুদুল হকের ইতিবাচক জীবনচেতনার আভাস পাওয়া যায়। অনু ও আব্দুল খালেক—এই দুটি মানুষ তাদের সত্তার ভেতরকার বিবিক্ততার বোধকে সযত্নে কাটিয়ে ওঠার কাজেও উদ্যোগী হয়। ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হক আসলে জীবনের মূল ধর্মকে অস্বীকার করেন না। তাই দেখা যায়, অনু তার সমস্ত বৈরিতা আর অন্তরায়কে মুহূর্তের সক্রিয়তায় বিস্মৃত হতে চায় বাইরের উন্মুক্ততার মধ্যে, বন্ধুদের সঙ্গে উদ্দাম সময় কাটিয়ে। মাধুরীকে হারানোর শূন্যতাকে সে পূর্ণ করে তুলতে

চায় সরুদাসীকে দিয়ে। আব্দুল খালেকের নৌকাভ্রমণের আয়োজনও তার শূন্যতায় পূর্ণতার অনুভূতি তৈরি করার প্রচেষ্টা। অনু ও আব্দুল খালেক—দুই বিভিন্ন বয়সী চরিত্র, কিন্তু চেতনার বিকাশবিরোধী পরিস্থিতি যে-কোনো বয়সের ব্যক্তিত্বকেই আহত করতে পারে এবং সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়াকে সামাল দেওয়ার জন্যও তাদের অস্তিত্ব সাড়া দেয়। *অনুর পাঠশালা* উপন্যাসের শেষে অনুর অন্বেষণ তাই অস্থির করে তোলে তাকে। এই অন্বেষণের মধ্যে থাকে হুমকিকে জয় করবার অধ্যবসায়। উপন্যাসের অন্তিমে অনুর জীবনবিরোধী অবস্থানটিকে ঔপন্যাসিক প্রতীকী রূপে প্রকাশ করেন। সেই অবস্থানের চরমভাবাপন্নতার চিত্র তিনি এক আঁচড়ে এঁকে যান:

> যে উঠোনে অনু দাঁড়িয়েছিল এতোক্ষণ এখন সেটাকে যারপরনাই ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো, উঠোনটা একটা ঘেয়ো জিভ। হা হয়ে জিভ বের করে রেখেছে কুটিল ঋষিপাড়া। মনে হলো বাঁশের খুঁটির গায়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বালতিটা। উঠোনে ওপরের ছায়াময় লালচে আলো অসম্ভব থমথমে, বুঝিবা এক করাল বিভীষিকা! তীক্ষ্ণ বর্শার খোঁচার মতো সহসা মনে হলো অনুর পায়ে পায়ে এক কুটিল ষড়যন্ত্রের মাঝখানে অগোচরে এসে পড়েছে সে; ফণা ধরে আছে এক কালকেউটে, ছোবল মারবে, একটু পরেই দাঁতে কাটবে তাকে। (মাহমুদুল ২০০৯: ৯০)

এমনকি ঋষিপাড়ার হরিয়ার বাজানো পাখোয়াজকে অনুর মনে হতে থাকে ‘প্রলয়ঙ্কর’। ‘পরাক্রান্ত ঘাতকের মতো’ অনুর দিকে তেড়ে যায় সেই পাখোয়াজ। আব্দুল খালেক তার বিচ্ছিন্নতা থেকে মুহূর্তের মুক্তি খুঁজতে গিয়ে রেখার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে ঠিকই, কিন্তু তার মুখে উচ্চারিত হয় সত্তার গভীরের উপলব্ধি: ‘আমাকে কোলে তুলে নাও মাধুরী’ (মাহমুদুল ২০০৯: ৯০)। বারাসাতের স্মৃতিতে গভীরভাবে দাগ কেটে বসে যাওয়া মাধুরীকে কোনোভাবেই এড়ানো যায় না আব্দুল খালেকের পক্ষে। অনু ও আব্দুল খালেক—এই দুজনের কারও বর্তমানই শুশ্রূষাযোগ্য নয়।

মাহমুদুল হকের মনস্তাত্ত্বিক ধারার উপন্যাসদ্বয়ে ব্যক্তির মনোজাগতিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির স্বভাবজাত কার্যকারণের ফল নয়, ইতিহাস ও সমকালের পরিপ্রেক্ষিত উপন্যাসদুটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা যেতে পারে, ইতিহাস ও সমকালের বিস্তৃত পরিসরটি যখন যাবতীয় ক্ষয় ও যন্ত্রণার শিকার, তখন সেই পরিসরে থাকা একটি সংবেদনশীল মনও সেই ক্ষতির আওতায় থাকে। মাহমুদুল হক সেই ক্ষতিগ্রস্ত ও যন্ত্রণাদগ্ধ মানসিক জগতের সন্ধান দিতে চেয়েছেন তাঁর *অনুর পাঠশালা* ও *কালো বরফ* উপন্যাসে।

মাহমুদুল হকের উপর্যুক্ত দুটি উপন্যাস বাংলাদেশের সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস হিসেবে মূল্যায়নযোগ্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) উপন্যাসে একটি বিশাল সময়ের আয়তন উপস্থাপিত হয়েছিল নায়ক মুহাম্মদ মুস্তাফার চেতনার আশ্রয়ে। মাহমুদুল হকের উপন্যাসদুটি চেতনাপ্রবাহরীতির হলেও তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রীতির চেয়ে আলাদা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর উপন্যাসের কাহিনির কাঠামোটিকে অক্ষুণ্ন রেখে কালের বিভিন্ন মাত্রাকে তার সঙ্গে সংলগ্ন করে দেন। *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাস অতীত-বর্তমান-ভবিতব্য বা স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন—এসবই কাহিনির অভিমুখকে সামনে রেখে বিস্তৃত হয়। কিন্তু

মাহমুদুল হক তাঁর উপন্যাসে কাহিনির একরৈখিকতার কাঠামোটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়ে নতুন এক কাঠামো গড়ে তোলেন। সেই কাঠামো আপাত-পরম্পরাহীন মনে হলেও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চেতনার সঙ্গে সম্পর্কসূত্রগুলো কোনোভাবেই সেই কাঠামোতে অনুপস্থিত থাকে না। রবার্ট হাম্ফ্রে তাঁর *স্ট্রিম অব কনশাসনেস ইন মডার্ন নভেল* (১৯৬৮) গ্রন্থে বলেন, চেতনাপ্রবাহরীতি নানামুখী হতে পারে। এতে থাকতে পারে রোমান্টিসিজম ও পরাবাস্তববাদ—সবই। (হাম্ফ্রে, ১৯৬৮) মাহমুদুল হক তাঁর উপন্যাসদুটিতে পরিপূর্ণ বাস্তবতাকেই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর কাহিনির বিন্যাস, চরিত্রের তৎপরতা, সংলাপ, মনোভাবনা—এসব কোনো ধারাবাহিকতার সূত্র মেনে চলে না। অনু কিংবা আব্দুল খালেকের চেতনার সক্রিয়তা কাহিনির আয়তনে ঘটে না, বরং তাদের চেতনার প্রতিক্রিয়ায় কাহিনি এগোয় কিংবা বাঁক নেয়। এদিক থেকে দেখলে অনু কিংবা আব্দুল খালেকের চেতনাশ্রয়ী উপন্যাসনির্মাণে মাহমুদুল হক কৃতিত্বের দাবিদার। বাংলাদেশের উপন্যাসের শিল্পবিচার এ দুটি উপন্যাসকে বাদ দিয়ে কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

মাহমুদুল হকের *অনুর পাঠশালা* ও *কালো বরফ* উপন্যাসদুটির প্রধান সুর নিঃসঙ্গতাবোধ। দেশকাল এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়। ব্যক্তির চেতনার পথ বাধাগ্রস্ত হয় এবং বিকাশও হুমকির মুখে পড়ে। ফলত উদ্ভূত পরিস্থিতিকে এড়ানোর জন্য তারা নিজেদের মতো সমাধান খুঁজে নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিজের একান্ত একটি জগৎ গড়ে তোলে, যেখানে সমস্যাগুলোর আপাত-উপশম থাকে, যদিও সেই জগতের বাস্তবিক কোনো ভিত্তি থাকে না। বাস্তবতার আঘাতে আচমকা সেই অধিবাস্তব জগতে ভাঙন ধরলে তারা তা মেনে নিতে পারে না, বরং তাদের মানসিক স্খলন ঘটে। আবার এদের কেউ-কেউ পরিবর্তিত এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এর মাঝেই টিকে থাকতে চেষ্টা করে। তাদের ছেড়ে-আসা স্মৃতিময় অতীতের মায়ায় তারা আটকে থাকে, ফলে স্মৃতিকাতরতা, উদাসীনতা ও বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়। এই অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে তারা সচেষ্ট হয়, কিন্তু ব্যর্থ হলে ক্রমশ সরে যেতে থাকে জীবনবিমুখতার দিকে। তবে মাহমুদুল হকের *অনুর পাঠশালা* ও *কালো বরফ* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো বিচ্ছিন্নতাবোধ ও জীবনবিমুখতার মধ্যেও জীবনের বহমানতায় সক্রিয় থাকতে চায়। অনু ও আব্দুল খালেক তাদের অন্তর্গত শূন্যতাবোধ ও জীবনবিমুখী অবস্থানকে চিহ্নিত করতে চায় এবং তা কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়। মাহমুদুল হক জীবনের মূল ধর্মকে আমলে নিয়ে জীবনবিমুখতার মধ্যে খুঁজে নেন জীবনবাদ। আর তাই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বিরূপতায়ও অনু ও আব্দুল খালেকের জীবনচেতনা ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের ব্যঞ্জনা জাগায়। ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের অনুপুঙ্খ অন্বেষণ এবং তার উপস্থাপনে *অনুর পাঠশালা* ও *কালো বরফ* কেবল মাহমুদুল হকের নয়, বাংলাদেশের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের ধারায় শিল্পবিচারে কালোত্তীর্ণ।

সহায়কপঞ্জি

আবু হেনা মোস্তফা এনাম (২০১৬)। 'অনুর পাঠশালা, দেজা ভু ও অন্যান্য', *কথাশিল্পী মাহমুদুল হক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

কালিদাস (১৯৬০)। *কালিদাসের মেঘদূত* (বুদ্ধদেব বসু অনূদিত), কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

জীবনানন্দ দাশ (২০১৫)। 'বোধ', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*। কলকাতা: সিগনেট প্রেস।

মাহমুদুল হক (২০০৯)। *অনুর পাঠশালা*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

মাহমুদুল হক (২০০০), *কালো বরফ*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

মাহবুবুল হক (২০১৪)। 'মাহমুদুল হকের অনুর পাঠশালা', *গল্পকথা* মাহমুদুল হক সংখ্যা, বর্ষ ৪ সংখ্যা ৫ (চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত)। রাজশাহী।

মাহবুব সাদিক (২০১০)। 'মাহমুদুল হক: স্মৃতিতে, চৈতন্যে', *আলোছায়ার যুগলবন্দি* মাহমুদুল হক সংখ্যা (আবুল হাসনাত, মফিদুল হক ও আবু হেনা মোস্তফা এনাম সম্পাদিত)। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

যতীন সরকার (২০১০)। 'মাহবুবুল হক ও তাঁর *কালো বরফ*, *আলোছায়ার যুগলবন্দি* মাহমুদুল হক সংখ্যা (আবুল হাসনাত, মফিদুল হক ও আবু হেনা মোস্তফা এনাম সম্পাদিত)। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

শচীন দাশ (২০১৪)। 'অনুর পাঠশালা: মাহমুদুল হকের ভিন্ন নির্মাণ', *গল্পকথা* মাহমুদুল হক সংখ্যা, বর্ষ ৪ সংখ্যা ৫ (চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত)। রাজশাহী।

Humphrey, Robert (1968). *Stream of Consciousness in The Modern Novel.* USA: University of California Press.

Stevenson, Robert Louis (1886), *Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde,* Longmans. London: Green & Co.